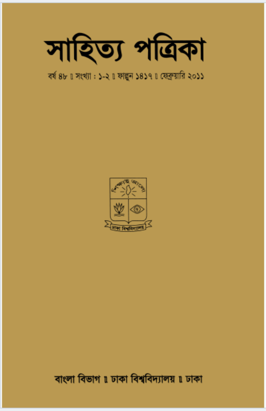

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কথাসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sohana Mahboob
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.6
Pages	৮৫-১০৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কথাসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

Check for updates

সোহানা মাহবুব*

মানবচেতনাস্থিত বোধ বা চিন্তা-চেতনার অবসাদহীন, ক্লান্তিহীন প্রবহমান অস্তিত্বকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা একটি রীতিতে ধারণ করতে চেয়েছেন যাকে তাঁরা Stream of Consciousness বা চেতন্যপ্রবাহরীতি নামে অভিহিত করেন[১]। M.H. Abrams চেতনাপ্রবাহরীতিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : 'The Stream of consciousness... is a mode of narration that undertakes to capture the spectrum and flow of a characters mental process, in which sense perceptions mingle with conscious and half-conscious thoughts, memories, expectations, feelings and random associations'[২]. চেতনাপ্রবাহরীতিতে ধারণ করা হয় চরিত্রচিত্তের প্রবহমান অন্তর্বাস্তবতাকে, যেখানে চরিত্রটির প্রত্যক্ষণ এবং অনুভবের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে থাকে চেতন এবং অর্ধচেতনস্তরের চিন্তারাশি, স্মৃতি, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কথাসাহিত্যিকেরা মানবমনের প্রাকবাচনিক স্তরে প্রবহমান এই সতত পরিবর্তনশীল ভাবনারাশিকে তাঁদের সাহিত্যে ধারণ করতে চাইলেন। যে কারণে চেতনাপ্রবাহরীতি হয়ে উঠল তাঁদের একমাত্র অন্বিষ্ট।

ষাটের দশকের শক্তিমান কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস [১৯৪৩-১৯৯৭] তাঁর গল্প-শরীরে চেতনাপ্রবাহরীতি রূপায়ণে তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী। চরিত্রের মনোগহনস্থিত চেতনার গতিকে ধারণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর ছোটগল্পের করণকৌশলে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন চেতনাপ্রবাহরীতি। ইলিয়াসের ছোটগল্পের চরিত্রগুলো তাদের জটিল মনস্তত্ত্ব, আবেগী সত্তা, উন্মূলিত মানসগহনে সৃষ্ট ক্ষত, সমাজ-বিবিক্ত নিঃসঙ্গতা, পলায়নপরতা, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা-নিঃসৃত কষ্টবোধের অভিঘাতে বার বার চেতনার বিবরে ডুব দিয়েছে, যে চেতনা মুহূর্তে মুহূর্তে কালপরম্পরা ভেঙে বিচরণ করেছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অগম্য পটে। ভাবনার বিষয় হলো, কেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর অন্বিষ্ট হয়ে উঠল চেতনার বিবরে বিচরণ? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও হয়ত মেলে! ইলিয়াস যে কালে গল্প লিখেছেন, সে কালের সমাজ প্রতিবেশের দিকে চোখ ফেরালে উপলব্ধ হবে কালটি ছিল উত্তাল। ১৯৫৮-এর আইয়ুবি সামরিক শাসন এবং তার ফলে পূর্ববাংলার ওপর আরোপিত মৌলিক গণতন্ত্রের [Basic Democracy] শৃঙ্খল, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববাংলার ওপর শোষণ-নির্যাতন, পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতির ফলে এটি ছিল একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠার কাল। একালের "বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সামনে দেখা দিল সঙ্কট। অবিকশিত সমাজের বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁদের সামনে খোলা থাকল তিনটি পথ— ১. পাক-শাসক চক্রের সঙ্গে আপসের; কিংবা ২. বিপ্লবের, অথবা ৩. সমাজ জীবন ও ইতিহাসের পথচ্যুত হয়ে

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মবিবরে পলায়নের। "ইতিহাসের গতিতে নয়, তাঁদের দৃষ্টি, মন ও মনন-সংযুক্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত ইয়োরোপীয় মধ্যবিত্ত ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিপ্রতিক্রিয়াজাত সাহিত্যভাবনা ও শিল্পরীতিতে"।[৩] ইলিয়াস ষাটের দশকের এই উত্তাল কাল-প্রতিবেশে গল্প রচনা করেছেন এবং ধারণ করেছেন সেই কাল-বৈশিষ্ট্যকে প্রগাঢ়ভাবে। আর সম্ভবত সে-কারণেই একজন মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গল্পে গণমানুষের পরিবর্তে উপজীব্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লীন চেতনা এবং চেতনার প্রবহমানতা। কেননা 'সমাজ-সংগঠন যদি হয় শ্রেণীবিভক্ত, জটিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ—চৈতন্যপ্রবাহও হবে তার নিঃসন্দেহে অনুগামী'।[৪] এর সত্যতা নিহিত এ রীতির আবির্ভাবকালে। চেতন্যপ্রবাহরীতি-আশ্রয়ী সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একাত্তরের মতোই এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কালে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় প্রতিবেশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যেমন পরিবর্তন আসে দৈশিক-বৈশ্বিক পটে, তেমনি মানবচৈতন্যেও এর প্রভাব পড়ে। যুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত জনমানস ছিল স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন। বিশ্বজুড়ে "রেনেসাঁসের মানববাদী প্রবর্তনা, ফরাসি বিদ্রোহ-জাত 'সাম্য, মৈত্রী, মানবতা' এবং শিল্পবিপ্লবের জনসুফল তখন নিঃশেষিত প্রায়। কৃষকজীবন বিপর্যস্ত, স্ফীত শ্রমিক শ্রেণী শোষণ-পীড়িত, মনুষ্যত্বের অবমাননাকর বস্তিজীবন ক্রমবর্ধমান ও বিশাল বর্ধিত যন্ত্রকীর্ণ শহরের প্রবলবেগে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মনীষীসম্প্রদায়ের চিত্তভূমি ছিন্ন-ভিন্ন"।[৫] নব্য ধনতন্ত্রের আগ্রাসনে মানুষ তার যৌথ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নৈঃসঙ্গ্যচেতনাগ্রস্ত মানুষগুলো সঙ্গীহীনতায় হয়ে ওঠে অন্তর্মগ্ন। 'তারা আত্মসমর্পণ করে কোনো উচ্চাশার কাছে নয়, আত্মবিবর লালিত ভাবমানসে'।[৬] নিরন্তর পরিবর্ধমান আধুনিক বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ব্যক্তিক সমস্যাসংকুল পট, বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর ক্ষতাক্ত পৃথিবীর কদর্য মুখচ্ছবি, বেকারত্ব-দাসত্ব-মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অনিশ্চিত জীবন শঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে ব্যক্তিবোধে আক্রান্ত হয় একালের মানুষগুলো। 'মানসিক আত্মসচেতনাও [Subjective-self-Consciousness]'[৭] তার এই ব্যক্তিবোধের জন্য দায়ী যা তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে তোলে।

মূলত "সমাজ ও একক ব্যক্তিসত্তা পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু আকস্মিক দুঃস্বপ্ন ও দুর্বিপাক যদি প্রথমটিকে আক্রমণ করে, তবে দ্বিতীয়টিও একইভাবে বিপর্যস্ত হবে। সমাজমানস যেখানে স্ফীতগর্ব, আধ্যাত্মিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত ব্যক্তিসত্তা, সেখানে গ্রহণযোগ্য কোন নৈতিক মানদণ্ড নেই। সেখানে মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন, স্পর্শকাতর অন্তর্ভুবনে নির্মাণ করবেন এক কৃত্রিম বাসযোগ্য পৃথিবী [Manageable Proportion] এটা মানসিক অন্তর্মুখিতা নয়, শ্বাসরুদ্ধকর পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে এটি ব্যক্তিনির্মিত নিরাপদ গুহা"।[৮] বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ক্রূর বাস্তবতার অভিঘাতে সমাজ-বিবিক্ত মনোবিবরবাসী এই সব মানবসত্তা বর্তমানকে নয়, বরং মানস-দোলাচলে আঁকড়ে ধরেছে স্মৃতিসর্বস্ব অতীতকে। আবার কখনো শুধু স্মৃতি নয়, তাদের অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে স্মৃতির ভেতরকার স্মৃতিও। স্মৃতি-সত্তা আর ভবিষ্যতের দোলাচলে সতত সঞ্চরমান চেতনাই হয়ে ওঠে একালের সাহিত্যিক, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী আর সমাজবিজ্ঞানীদের অভীষ্ট। আর এরই ফলস্বরূপ অন্তশ্চেতনার স্বভাব স্বর এবং তার বহুবর্ণিল পদচারণা নিয়ে

তাঁদের নিবিষ্ট গবেষণা জন্ম দেয় বেশ কিছু যুগান্তকারী তত্ত্বের। সাহিত্য-অর্থনীতি-রাজনীতি-দর্শন এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রকাশ ঘটে নবচিন্তার।

কার্ল মার্কস তাঁর *Economic and Philosophic Manuscript of 1844* গ্রন্থে সর্বপ্রথম শ্রমিক এবং তার শ্রমোৎপাদিত বস্তুর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাকে ধারণ করেন 'Allienation' নামক তত্ত্বাধারে, যে তত্ত্ব মানুষকে ব্যাখ্যা দেয় কেমন করে পুঁজিবাদের আগ্রাসনে একজন শ্রমিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার শ্রমলব্ধ বস্তুভোগে এবং সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ কেমন করে তাকে সমাজ থেকে একাকী অন্তর্মনস্ক করে তোলে, করে তোলে স্মৃতিকাতর, অতীতচারী। কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যেয় মানবচৈতন্যের এই অন্তমর্নস্কতার স্বরূপভাষ্য অর্থনীতিবিদ কিংবা সমাজতাত্ত্বিকদের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানীদের মননে রূপায়িত হল নতুন মাত্রায়।

সিগমুন্ড-ফ্রয়েডের *'Die Traumdeutung'* বা *'The interpretation of Dreams'* কিংবা *Three essays on the theory of sexuality* [১৯০৫], *The unconscious* [১৯১৫], *The ego and the Id* [১৯২৩] গ্রন্থগুলো মানবচেতনার অভীপ্সা সম্পর্কে পাল্টে দেয় সকল ধারণা। বিশ্বপাঠকের মানসপাতায় তিনি প্রোথিত করলেন স্বপ্ন, চেতনা, অবচেতনা, প্রাকচেতনার গূঢ়ার্থ, তাদের জানালেন 'Dreams were the product of repressed desires, akin to neuroses'[৯]। তাঁর এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কার আরো বেশি সমৃদ্ধ হল আলফ্রেড অ্যাডলার এবং সি জি ইয়ুঙ-এর ভাবনায়। আর একালেই চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত সময়-সম্পর্কিত অন্য এক যুগান্তকারী ভাবনার প্রকাশ ঘটালেন হেনরি বার্গসঁ তাঁর *Introduction to metaphysics* গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি "যান্ত্রিক সময় ও মনস্তাত্ত্বিক সময়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন...যার ফরাসি শব্দরূপ La-duree অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক বা ব্যক্তিগত সময়। ...বার্গসঁর ব্যাখ্যায় এই মনস্তাত্ত্বিক বা ব্যক্তিগত সময় কোনো ঘণ্টা কিংবা মুহূর্তের ক্রমানুপাতের নিয়ম মেনে চলে না, এ ক্ষেত্রে সময় কোনো ব্যক্তি কিংবা চরিত্রের একান্ত অন্তর্গত প্রবাহ যার গতিরেখা কখনো বর্তমান থেকে অতীতে আবার অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ধাবিত"।[১০] বার্গসঁর *Matter and Memory* [১৮৯৭] গ্রন্থও সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়। একদিকে ফ্রয়েডের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, চেতনা-সম্পর্কিত নবধারণা এবং অন্যদিকে বার্গসেঁর মনস্তাত্ত্বিক সময়-সম্পর্কিত চিন্তা মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এ সময়ই প্রকাশিত উইলিয়ম জেম্‌সের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Principles of psychology*-তে [১৮৮৪] লিপিবদ্ধ হয় নতুন এক অভিধা। মানবমনের চেতন, অবচেতন কিংবা প্রাকচেতন স্তরে প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে তিনি অভিহিত করেন 'Stream of consciousness' নামে। 'The Stream of thought' পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন :

> Consciousness then, does not appear to itself chopped up in bits. Such words as 'chain or train' do not describe fitly as it presents itself in its first instance. It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'stream' are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it, Let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life.[১১]

জেম্‌সের এই অবিস্মরণীয় উক্তি, চিন্তনপ্রক্রিয়ার অদ্ভুত আচরণ-সম্পর্কিত তাঁর এই ভাবনা কথাসাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। শুধু কথাসাহিত্যই নয়, চিত্রকলারও অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে মানব মনস্তত্ত্ব। বিশ শতকের শুরুতে গ্রাফ্‌টন গ্যালারিতে রজার ফ্রাই ও ডেসমন্ড্‌ ম্যাকার্থি আয়োজিত ভ্যানগঘ, গগাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজান প্রমুখ post impressionist শিল্পীগোষ্ঠীর চিত্রকলাতে একালে উদ্ভূত নানা তত্ত্ব-বিচ্ছুরিত ভাবনা-আলোর প্রতিফলন ঘটে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের অন্তর্মানস আলোড়িত হয় এই চিত্রকলার প্রদর্শনী দ্বারা। তিনি ঘোষণা দেন : 'In or about December, 1910, human character changed'।[১২] যদিও ১৯১০-এর মতো কোনো নির্দিষ্ট বছর থেকে মানবস্বভাব বদলে যাবার বিষয়টি একটু অদ্ভুত, তবু গভীরভাবে ভেবে দেখলে উপলব্ধ হয় উল্‌ফের এই মন্তব্যের পিছনে ছিল অন্যরকমের এক ব্যঞ্জনা। তিনি বলতে চেয়েছেন, ১৯১০-এর পর থেকেই বহির্বাস্তবতার পরিবর্তে দুর্জ্ঞেয় মানবমনের বিসর্পিল গতিকে বোঝার বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্য, চিত্রকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে পড়ে এর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া। মানবমনের চেতনা নিয়ে রচিত হয় সাহিত্য, অনিবার্যভাবে আধারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে আধেয়রও। ভিক্টোরীয় যুগের আদি-মধ্য-অন্তসংবলিত প্লটের পরিবর্তে কথাসাহিত্যিকদের অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে কালপরম্পরাচ্ছিন্ন এবং ঘটনাপরম্পরাহীন এক অভিনব প্লটের, সাহিত্য কাঠামোয় প্রোথিত হয় চেতনাপ্রবাহরীতি।

চেতন্যপ্রবাহরীতিকে যাঁরা সাহিত্যের কাঠামোতে বিন্যস্ত করলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম লরেন্স স্টার্নের নাম করা যেতে পারে। তিনি *Life and opinion of Tristram Shandy* উপন্যাসে অসচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন চেতনাপ্রবাহরীতিকে 'সময়ের অনানুপর্বিক ব্যবহারে এবং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা সৃষ্টির একাগ্রতায়'।[১৩] তাঁর পর পরই ফরাসি ঔপন্যাসিক এড্যুয়ার্ড দ্যুজারদ্যাঁর 'Les Lauriers sont coupes' [১৮৮৮] উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় এ রীতি। যদিও সেটি খুব জোরালো প্রচেষ্টা ছিল না, তবু জানা যায় Dujardin-এর এই উপন্যাসেই কথাসাহিত্যিক James Joyce খুঁজে পান স্বগতোক্তি বা Soliloquy-র মূল প্রক্রিয়া। জোসেফ কনরাডের *Heart of Darkness* [১৯০২] গ্রন্থটিতেও উপ্ত ছিল চেতনাপ্রবাহরীতির আদিবীজ। মূলত James Joyce-ই প্রথম চৈতন্যপ্রবাহরীতির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটান তাঁর *ইউলিসিস* উপন্যাসে। Joyce তাঁর *A portrait of the Artist as a young man* [১৯১৬] গ্রন্থেই Stream of Consciousness রীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। *ইউলিসিস* উপন্যাসটি চৈতন্যপ্রবাহরীতির অন্তর্বুননে এবং মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় অসাধারণ এক রচনাকর্ম, যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিনের যান্ত্রিক সময়-কাঠামোতে জয়েস অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন Leopold Bloom, Stephen Daedalus এবং Molly Bloom-এর বহু বছরের চেতনাভিজ্ঞতাকে। তবে তখন পর্যন্ত কথাসাহিত্যে চেতন্যপ্রবাহরীতিকে কোনো অভিধায় চিহ্নিত করা হয়নি। ডরোথি রিচার্ডসনের *Pointed Roof* [১৯১৫] উপন্যাস আলোচনার সময় মে সিনক্লেয়ার ১৯১৮ সালে প্রথম Stream of Consciousness কথাটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্শেল প্রুস্তও তাঁর *Remembrance of Things past* [১৯১৩-২০] উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন, "যে অতীত হারিয়ে গেছে তাকে শিল্পের চিরন্তনতার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনতে।... উপন্যাসের কাহিনীকার বা

কথক ক্রমাগত বর্তমান আর অতীতের মধ্যে আসা-যাওয়া করেছে, তার চেতনায় সময় কোন সুস্পষ্ট বোধগম্য ক্রম অনুসারে অতিবাহিত হয় না। কোন যান্ত্রিক ঘড়ির কাঁটায় তার প্রবহমানতার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত নয়।"[১৪] উপন্যাসে প্রুস্ত বার্গসেঁর মনস্তাত্ত্বিক কালচেতনা এবং স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে নায়কের মানসবিচরণশীলতাকে মুখ্য করে তুলেছেন। প্রুস্তের পর চেতন্যপ্রবাহরীতি ব্যবহারের সার্থক রূপকার ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর *Mrs. Dalloway* [১৯২৫], *To the Light House* [১৯২৭], *The Waves* [১৯৩১], উপন্যাসত্রয়ে আদি-মধ্য-অন্ত সংবলিত কোনো প্লট ব্যবহার না করে চরিত্রের অন্তশ্চেতনায় খেলা করা উল্লম্ফনধর্মী চিন্ত রাশিকেই মুখ্য করে তুলেছেন। তাছাড়া একইভাবে না হলেও উল্‌ফের সমসাময়িককালে চেতন্যপ্রবাহরীতি নিয়ে কাজ করেন আমেরিকান কথাসাহিত্যিক উইলিয়ম ফকনার। ফকনারের *The Sound and the Fury* [১৯২৭] উপন্যাসে Benjy চরিত্রের অন্তশ্চেতনায় স্বরিত গীতল সুর-মূর্চ্ছনার অনুরণন ঘটেছে স্মৃতিকাতরতার মধ্য দিয়ে, যেখানে চরিত্রটির আঠারো বছর বয়সী জীবনের কোনো এক বিশেষ মুহূর্ত বার বার মুখর হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পকারদের মধ্যে 'অন্তর্মুখী আত্মভাষণ [Internal Monologue], স্মৃতি-বিস্মৃতির নিগূঢ় পর্যালোচনা এবং অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা'[১৫] নিয়ে কাজ করেছেন হেনরি জেম্‌স্‌, জেম্‌স্‌ জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, উইলিয়ম ফকনার প্রমুখ। বিশেষ করে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *Kew Garden,* জেম্‌স্‌ জয়েসের *Dubliners* গল্পগ্রন্থে চেতন্যপ্রবাহরীতি ব্যবহৃত হয়েছে চমৎকার নৈপুণ্যে। মূলত পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোয় বিন্যস্ত ভিক্টোরীয় রীতি এবং লেখকের উপস্থিতির আধিক্য একালের সাহিত্যিকদের মনে এক প্রবল বিদ্রোহের জন্ম দেয়। তাঁরা মনে করেন, লেখকের উপস্থিতি চরিত্রের অন্ত শ্চেতনা রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। "যেন অসংকোচ আন্তরিকতার অভাব থেকে যায়। চরিত্রের চিন্তা-ভাবনার ভেতরকার পরস্পরবিরোধী অথচ সত্য রূপটি তার কিছুটা স্বাভাবিক অপ্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে প্রকাশ পেলে তা চরিত্রের বাস্তবতার মাত্রাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। নিছক লেখকের কর্তৃত্বে সেই বাড়তি মাত্রাটি পাওয়া যায় না।...তাঁদের মনে হলো, নতুন যুগের সামাজিক চাপে মানুষের চরিত্রের যে জটিলতা বেড়েছে তাকে প্রকাশ করতে গেলে পুরনো সামাজিক উপন্যাসের বর্ণনারীতিতে লেখকের যে সর্বাত্মক প্রাধান্য তা আর চলে না। চরিত্রগুলিকে নিজেদের মুখোমুখি করা দরকার। এইভাবেই অন্তর্মুখী চিন্তা ও অনুভব ধীরে ধীরে উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।"[১৬] শুধু ইয়োরোপ নয়, বাংলা সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ ঘটল চেতন্যপ্রবাহরীতির। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ*, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত*, বুদ্ধদেব বসুর *লালমেঘ, নীলাঞ্জনের খাতা*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কাকজ্যোৎস্না* [১৯৩১], বনফুলের *রাত্রি* [১৯৪১], *সে ও আমি* [১৯৪৩], গোপাল হালদারের *একদা* [১৯৩৯], *অন্যদিন* [১৯৫০] এবং *আর একদিন* [১৯৫১], ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* [১৯৩৫], *আবর্ত* [১৯৩৭] এবং *মোহনা* [১৯৪৩], সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* [১৯৪৫] চেতনাপ্রবাহরীতির সফল রূপায়ণ। বাংলাদেশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* [১৯৬৪] এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* [১৯৬৮] উপন্যাসে মেলে স্যামুয়েল বেকেটের [১৯০৬-১৯৮৯] *Molloy* [১৯৫০], *Malone Dies* [১৯৫১] এবং *The Unnamable* [১৯৫২] উপন্যাসত্রয়ীর প্রভাব, যেখানে চেতনাপ্রবাহরীতির বিন্যাস ঘটেছে চমৎকারভাবে। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের

এক মহিলার ছবি [১৯৫৯], *স্তব্ধতার অনুবাদ* [১৯৫৮], দ্বিতীয় দিনের কাহিনী [১৯৮৪], রাজিয়া খানের *অনুকল্প* [১৯৫৯], রশীদ করিমের *প্রেম একটি লাল গোলাপ* [১৯৭৮], বশীর আল হেলালের *কালো ইলিশ* [১৯৭৯], শামসুর রাহমানের *অক্টোপাস* [১৯৮৫], মঞ্জু সরকারের *তমস* [১৯৮৪] চেতন্যপ্রবাহরীতি বিন্যাসের সার্থক উদাহরণ। এ উপন্যাসগুলোর মূল প্রবণতা "চেতন থেকে অবচেতনে চরিত্রের যাওয়া-আসা, ছিন্ন-ভিন্ন চরিত্রের স্বীকারোক্তি অন্তঃসংলাপ, চিন্তার উল্লম্ফনধর্মী স্বেচ্ছাচারের ছদ্মবেশে অর্থপূর্ণ আত্মকথন; আত্ম-অনুসন্ধানের আত্মদহন; বোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে নিরন্তর মুখোমুখি হওয়া; মনের অনাবিষ্কৃত গহ্বরে চেতনার হেডলাইট..." ।[১৭] ছোটগল্পকারদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাম করা যেতে পারে, যাঁর 'জাহাজী', 'নয়নচারা', 'মৃত্যুযাত্রা', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' প্রভৃতি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা। অন্যদিকে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ তাঁদের গল্প-শরীরের পরতে পরতে প্রোথিত করে দিলেন, চেতনাপ্রবাহরীতিকে। আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমসাময়িক লেখক। মান্নান সৈয়দের ভাষ্যমতে, ইলিয়াস জয়েস পড়েছিলেন এবং জয়েসের *ডাবলিনার্স* গ্রন্থটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল যথারীতি। অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে *ডাবলিনার্সের* আধার নয় শুধু, এর আধেয়ও হয়ত-বা অবচেতনে ইলিয়াসের লেখক সত্তায় অনুরণন তুলেছিল। যে কারণে ডাবলিন শহরের অনুষঙ্গে ইলিয়াস লিখেছিলেন পুরান ঢাকার জীবনস্রোতের কথকতা এবং সেখানকার জনমানুষের চেতনাপটে খেলা করা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের নানা রঙিন সময়-অভিজ্ঞতাকে।

ইলিয়াস তাঁর গল্পে একটি দিন বা একটি বিকেল, সন্ধ্যা বা রাতের পরিসরে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন একটি চরিত্রের জীবনাভিজ্ঞতার বিস্তৃত পরিসর, উন্মোচন করতে চেয়েছেন তার চেতনাস্থিত বিচিত্রমাত্রিক প্রান্তগুলোকে। স্মৃতি-শ্রুতি-স্বপ্ন-কল্পনা-ইল্যুসনের ভেতর দিয়ে বারবার ইলিয়াসের চরিত্রগুলো অতীত-বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের পথ হেঁটেছে চেতনায়। কখনো স্মৃতির মধ্যকার স্মৃতি, কখনো নস্টালজিক আবেগ অনুষঙ্গে চেতনার বিবর পরিক্রমণ আবার কখনো বা স্বপ্ন ইল্যুসনের ঘোরে, যাদু-বাস্তবতার টানাপড়েনে চেতনাবাসী হয়ে উঠেছে ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রগুলো। ছোটগল্পের প্লট বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবনের কোনো একটি মুহূর্তকে উদ্ভাসিত করে তোলা নয়, বরং গল্পস্থিত চরিত্র-চিত্তের অবিন্যস্ত চিন্তার টুকরোই ইলিয়াসের গল্পের প্লট নির্মাণ করেছে। তাই চরিত্রের চেতনাগহনে খেলা করা চিন্তার উল্লম্ফী-স্বভাব বিন্যাসে ইলিয়াসের গল্পে উল্লম্ফনধর্মিতা উপজীব্য হয়ে উঠেছে। সেই সাথে আরাধ্য হয়ে উঠেছে চিন্তারাশির কার্যকারণ শৃঙ্খলালুপ্ত, যান্ত্রিক-সময়ছিন্ন এক অভিনব গল্প-কাঠামো । এছাড়াও তিনি চরিত্রচিত্তের জটিল টানাপড়েন, তাদের প্রাকবাচনিকস্তরে খেলা করা চিন্তারাশির বিসর্পিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়ণে ব্যবহার করেছেন প্রতীকী পরিচর্যা, পরাবাস্তবতা, যাদু-বাস্তবতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তর্ভাষণরীতি [Direct/Indirect Monologue], ন্যারেটেড মনোলগ এবং উত্তম পুরুষ ও সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শীর বিবরণ [Omniscient Description]। সাধারণত চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যকর্মে উত্তম পুরুষ বা কথক 'আমি'র প্রাধান্য থাকে। সেদিক থেকে কিন্তু ইলিয়াসের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ছাড়া অন্য গল্পগুলোতে 'আমি' পুরুষের দেখা মেলে না। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে নায়ক রঞ্জু এবং লেখকের সত্তা একাকার হয়ে স্বরিত [Implied author]। রঞ্জুর আত্মগত ভাষণের সঙ্গে পাঠকের অন্তর্যোগ ঘটেছে সরাসরি।

অন্যদিকে আনোয়ার আলি [উৎসব], হানিফ, ইব্রাহিম ওস্তাগর [ফেরারী], প্রদীপ [অন্য ঘরে অন্য স্বর], সমরজিৎ-ইফতিখার [খোঁয়ারি], রমিজ আলির [কীটনাশকের কীর্তি] চেতনসত্তা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের সর্বদর্শীর বিবরণ। চরিত্র এবং পাঠকের মাঝখানে লেখকের উপস্থিতি ঘটেছে এসব গল্পে। প্রচলিত সাহিত্যকর্মেও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়, তবে সেখানে চরিত্রের Flux of Mind বা চেতনার প্রবহমানতার ওপর জোর দেয়া হয় না, যা ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রের চেতনাংশ ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে চমৎকারভাবে। এখানেই ইলিয়াসের গল্পের অভিনবত্ব। অন্যদিকে চেতনার প্রবহমানতা এবং চরিত্রগুলোকে নিজেদের মুখোমুখি করে তোলার প্রচেষ্টায় ইলিয়াস তাঁর গল্প ভাষায় ব্যবহার করেছেন অন্তরঙ্গ আত্মকথন [Internal Monologue] রীতি। অন্তরঙ্গ আত্মকথনরীতির সঙ্গে নাটকীয় একোক্তির [Dramatic Monologue] রয়েছে এক প্রগাঢ় পার্থক্য। নাটকীয় একোক্তিতে কবি বা লেখক সত্তা নিজে কথা বলেন না, চরিত্রই নাটকীয় পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তার মনোবাসনার প্রকাশ ঘটান, যার আত্মভাষণে নিহিত থাকে স্ব-সত্তার বিচিত্রমাত্রিক বৈশিষ্ট্য। নাটকীয় একোক্তিতে থাকে না কোনো রহস্যময়তা কিংবা চেতনা বা সত্তার দোলাচল, কিন্তু চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যকর্মে আত্মকথনরীতিতে ধারণ করা হয় একটি চরিত্রের চেতনাস্রোতকে, যার রূপ থাকে অপরিস্ফুট, অবিন্যস্ত, অযৌক্তিক এবং কখনো কখনো অসংলগ্ন এবং সেই সাথে অনুভূত হয় কালগত দোলাচল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে জেম্‌স্ জয়েসের *ইউলিসিস* উপন্যাসের কথা। দ্যুজারদ্যাঁর *Les Lauriers Sont Cou'pes* উপন্যাসে প্রথম Soliloquy বা স্বগতোক্তির মূল প্রক্রিয়া খুঁজে পান জেমস্। এছাড়া Hamlet's Soliloquy-তেও তিনি এ প্রক্রিয়ার সূত্র পান। *ইউলিসিস* উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স অংশেই উপস্থাপিত হয়েছে Molly Bloom চরিত্রের অন্তরঙ্গ আত্মকথন, যেখানে চল্লিশ পাতা জুড়ে উঠে এসেছে এ চরিত্রের যতি-ছেদচিহ্নহীন মানসকথন। বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির সার্থক রূপকার ধূর্জটিপ্রসাদের *অন্তঃশীলা* উপন্যাসের খগেন্দ্রনাথ রায়ের মানস অভিব্যক্তি রূপায়ণেও এ রীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রগুলো যখন স্ব-সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তাদের মানসকথনে তীব্রভাবে অনুভূত হয় চরিত্রগুলোর চেতনসত্তার আন্দোলন আর সেই সঙ্গে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা, স্মৃতিতে ডুবে যাবার গীতল আবেগ। অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি স্বরিত নয় তাদের এই অস্ফুট ভাবনা, বরং ইলিয়াসের হানিফ, সমরজিৎ, রঞ্জু, ইফতিখার কিম্বা রমিজ আলির চেতনায় খেলা করা তাদের প্রাতিস্বিক ভাবনারাশি নিজের প্রতিই ধ্বনিত :

> আমার জানালায় রোদন-রূপসী বৃষ্টির মাতাল মিউজিক, পাতাবাহারের ভিজে গন্ধভরা সারি, বিষাদবর্ণ দেওয়াল; অনেকদিন পর আজ আমার ভারি ভালো লাগছে। ছমছম করা এই রাত্রি, আমারি জন্যে তৈরি এরকম লোনলী-লগ্ন আমি কতোদিন পাইনি, কতোকাল, কোনোদিন নয়।... এইসব রাতে কিছু পড়তে পারি না আমি, সামনে বই খোলা থাকে, অক্ষরগুলো উদাস বয়ে যায়, যেনো অনন্ত-কাল কুমারী থাকবার জন্যে একজন রিক্ত রক্তাক্ত জন্মদান করল ওদের। চায়ের পেয়ালা তিনটে ভাঙা পাতা ঘড়ির কাঁটা হয়ে সময়কে মন্থর কাঁপায়।... কতোদিন আগে ভরা বাদলে আশিকের সঙ্গে আজিমপুর থেকে ফিরলাম সাতটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে', সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দ্যাখা একটি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো টলটল করে। [নিরুদ্দেশ যাত্রা]

এ অংশে রঞ্জুর প্রাকবাচনিক স্তরে প্রবহমান অস্ফুট চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে চমৎকারভাবে, যেখানে গীতলতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তার চিন্তনপ্রক্রিয়ায় কোনো কার্যকারণ শৃঙ্খলার প্রকাশ ঘটেনি। বরং কালের দোলাচল আর অবিন্যস্ত চেতনারই ছায়াপাত লক্ষ করা যাবে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে রঞ্জুর নিঃসঙ্গ, অন্তর্মুখী সত্তার আর্তনাদ [Inward Turning], নগর জীবনের যান্ত্রিক পরিসরে সমাজবিবিক্ত, শৈশবের ছড়ার ছবি, কাজলাদিদি আর 'পথের পাঁচালী'র স্নেহসৌগন্ধ বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাকাতর অন্তর্ভাষণের রূপরেখা মেলে। এই চরিত্রটি তার চারপাশের অচেনা হয়ে যাওয়া চেনা বলয়ে অন্বেষণ করেছে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের ঘ্রাণ, আর তা করতে গিয়েই মানস বিবরে ডুব দিয়েছে তার চেতনসত্তা। নিজেই সে কথা বলেছে নিজের সাথে। সেক্ষেত্রে অতীতচারিতাই হয়ে উঠেছে তার অন্বিষ্ট। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন 'চেতনা ও চিন্তাপ্রবাহে স্মৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, সেই হেতু চিন্তাস্রোত বা চেতনাস্রোত অপরার্থে স্মৃতিরই প্রবাহ।'[১৮] ইলিয়াসের গল্পগুলোতে স্মৃতি অনুষঙ্গের মধ্য দিয়েই তাঁর চরিত্রগুলো চেতনাস্রোতে গা ভাসায়। তবে তা বতর্মানেরই প্রসারণ। ইলিয়াসের রঞ্জু, সমরজিৎ, ইফতিখার, হানিফ, আনোয়ার আলি কিংবা রমিজ স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমেই অতীত ও বর্তমানের কালপটকে এক করে তোলে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে বহুদিন পর মনোটনাস শহরের যান্ত্রিকতায় 'রূপসী বৃষ্টির মাতাল মিউজিক' রঞ্জুর চেতনার ঘুম ভাঙায়। চেতনার এলোমেলো পদচারণায় কালপরম্পরাছিন্ন স্মৃতিরাশি রঞ্জুর মনোগহনে খেলা করে :

> ওরা চলে যাবার পরো আম্মার শাড়ির ঘুমঘুম গন্ধ সারা ঘরে নিথর জমে রইলো। নীল আলোয় ফ্যাকাশে গন্ধ, বাইরের সোঁদা মাটির আভাস, আব্বার ছড়িয়ে যাওয়া সিগ্রেটের লুপ্ত ধোঁয়া, নিচে পুরনো স্টেটসম্যান, ধুলোপড়া স্লিপার, টেবলে শোপেন হাওয়ারের অনন্ত সৌরভ...এই ঘরের গন্ধ দিন দিন পাল্টাচ্ছে। আগে ভোরবেলা এখানে নতুন 'ছড়ার ছবির' গন্ধ করত।... মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গিয়েছে আম্মার নীল জর্জেটের শাড়ীর গন্ধে। এই শাড়িটার পুরনো পুরনো গন্ধ ছিল একটা। ন্যাপথলিন, বাক্সের চামড়া, বাতাস সব মিলিয়ে এই সুবাস কতোরাতে রঞ্জুকে জাগিয়ে তুলেছে। 'আম্মা, ছবি দেখতে যাচ্ছো?' 'ওমা, তুই ঘুমোসনি এখনো?' শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আম্মা মিষ্টি করে তাকাতো,... তখন রূপমহলে কেবল বাঙলা ছবি চলতো...সঞ্জু আর আমি আব্বার সঙ্গে নিউ পিকচার হাউসে টারজানের ছবি দেখে এলাম। তখন বুঝি সিনেমায় সিগ্রেট খাওয়া বারণ নেই... হঠাৎ দ্রুত ও বিরতিহীন ঘণ্টাধ্বনি শুনে দিশেহারা বুকে রঞ্জু জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো... [নিরুদ্দেশ যাত্রা]

রঞ্জুর মনে হতে থাকে 'রাস্তায় রিকশা চলছে ছল ছল করে যেনো গোটিয়ার বিলে কেউ নৌকা বাইছে।' গোটিয়ার বিল এ চরিত্রটির শৈশব স্মৃতিবিজড়িত এক অনুষঙ্গ। মনে পড়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পের 'আমু' চরিত্রের কথা। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের অভিঘাতে যে চরিত্রটি তার স্ব-গ্রাম স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে চেতনার বিবরে আত্মগোপন করে, যে বিবরের দেয়ালে দেয়ালে মুদ্রিত ময়ূরাক্ষী নদীর সৌন্দর্য; ময়ূরাক্ষী—তার চেনা স্বজন; বর্তমান নাগরিক ক্রূর মুখগুলোর অচেনা হিংস্রতা তাকে পরাবাস্তব জগতে নিয়ে যায়। ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাজপথকে তার মনে হয় সজলস্নিগ্ধ ময়ূরাক্ষী। কিন্তু 'ঘুমের স্রোত মরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী!' নিরস্তিত্বের যন্ত্রণায় কাতর আমু [নয়নচারা], রঞ্জু [নিরুদ্দেশ যাত্রা], প্রদীপ [অন্য ঘরে অন্য

স্বর], কিম্বা ইফতিখারের অন্তঃসত্তায় শৈশব-কৈশোরের চেনা বলয়ের চেনা ঘ্রাণ ঘুরপাক খায়। আধুনিক সাহিত্যিকেরা বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর নিঃসঙ্গ মানস পদচারণার শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যে, যাদের অনুসারী ইলিয়াস লিখেছেন "সমাজের ভেতর থেকে এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলো বজায় রেখেও মানুষ কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার এলাকা ঢুকে পড়ে একটি বাড়ির ভেতর, বাড়ি গুটিশুটি মেরে ঠাঁই নেয় ঘরে, ঘর পরিণত হয় কামরাতে এবং ঐ কামরাও শেষ পর্যন্ত সংকুচিত হতে হতে রূপ নেয় কোঁচকানো শরীরে। সবাই এবং আর সবাই তাঁর কাছে অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর। তার দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। তার চেয়েও বড় কথা কারো হাতে তার আস্থা নেই।"[১৯] রঞ্জুর মতো সমাজবিবিক্ত, আস্থাহীন অন্য আরেক চরিত্রের দেখা মেলে 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে, যেখানে স্বদেশের জল-মাটির চেনাবলয়বিচ্ছিন্ন প্রদীপ সংখ্যালঘু ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। তার মানসচৈতন্যে বারবার ঘুরপাক খায় পিতার স্মৃতি জড়ানো স্বদেশ আর স্বজন। গল্পের শুরুতেই লেখক ব্যাখ্যা করেননি প্রদীপ ইতিবৃত্তের। ধীরে ধীরে নানা অনুষঙ্গে বেরিয়ে এসেছে প্রদীপের স্বদেশ ছেড়ে ওপার বাংলায় পাড়ি জমানোর কথকতা, তার পিতার স্মৃতি আর পিসিমার কথা। ঘটনাপরম্পরাহীন, কালপরম্পরাছিন্ন এক অতীত অধ্যায় ধীরে ধীরে প্রদীপের চেতনায় উঠে আসে গল্পে, যা লেখকের সর্বদর্শীর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রদীপের চেতনার অতীতচারিতায় একাত্তর এবং একাত্তর-পরবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে আসা অত্যাচারের ছায়াপাত ঘটেছে এ গল্পে।

শেকড় ওপড়ানো অন্তঃসত্তায় আশ্রয়সন্ধানী প্রদীপ স্বস্তি পায় পিসিমার সান্নিধ্যে। পিতার গল্প শুনতে শুনতেই প্রগাঢ় এক স্বপ্নাবেশ তাকে ঘিরে ধরে, চেনা স্থান-কালের বদল ঘটে মুহূর্তে। স্থান বা কালের এই ত্বরিত বদল এ গল্পে বাড়তি মাত্রা হিসেবে যোগ করেছে যাদুবাস্তবতা "যাদুবাস্তবতার মূল লক্ষণের মধ্যে স্বপ্ন, কল্পনা, লোকবিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবতা ও সত্যের সংমিশ্রণের প্রকাশ ঘটে কাহিনীক্রমে। স্থানকালের সহসা বদল রহস্য, অলৌকিকতা, রূপকথার চমক, অভিব্যক্তিবাদী কখনো পরাবাস্তববাদী বর্ণনা, আকস্মিকতা ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনা ও পরিস্থিতি যাদুবাস্তবতায় ঘটে।"[২০] ইলিয়াস যাদুবাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে এ গল্পে চমৎকার নৈপুণ্যে ইলিয়াস যাদুবাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন :

> একটানা গদ্যের গুঞ্জরণে প্রদীপ নিজেই একবার তার বাবার কোলে কখনো বা পিসিমার কোলে দোল খায়। এরকম একটানা দুলুনির ফলে চারিদিকের রাত্রিকাল লুপ্ত হয়ে যায়, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শাল-গ্রাম শিলা পাহাড়ের স্মৃতিতে কাঁপে; ছোট মঞ্চে অষ্ট ধাতুর রাধা শ্যাম নিজেদের অস্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পরস্পরকে দ্যাখে। কৃষ্ণের দুষ্টু ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসে লুকানো হাসি। 'চল ঐ ঘরে গিয়া মুড়ি লইয়া আহি।' পিসিমার এই আহ্বান বা দরজা খুলে পিসিমার বারান্দায় চলে যাওয়া-প্রদীপ এসব কিছু লক্ষ করেনি। রাধাকৃষ্ণের নিস্তরঙ্গ ও বিলাসী নয়নের মুগ্ধ তৎপরতায় সে তার মাথার ওপরের ছাদ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়াল এবং নিচের মেঝেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল দাঁড়িয়েই থাকে। তার টাটকা সদ্যোজাত চোখে কাজলের মতো জমেছে পাতলা এক পরত স্বপ্ন, প্রদীপ এমন কি তাও টের পায়নি! [অন্য ঘরে অন্য স্বর]

চেতনার গহন ভেতরে বুঁদ হয়ে থাকা প্রদীপ পিসিমার ঘরের চন্দন, শশা-কলা, ধূপধুনো-কর্পূরের ঝাপসা গন্ধ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, শীতকালের জুড়িয়ে যাওয়া পদ্মা, পিসিমার কণ্ঠনিঃসৃত মিষ্টি সুরেলা গুঞ্জনে নস্টালজিক হয়ে ওঠে। তার নস্টালজিয়া আর অনিকেতচেতনা এ গল্পে শিল্পভাষ্য পেয়েছে। ইলিয়াসের 'খোঁয়ারি' গল্পের অবাঙালি ইফতিখারের উন্মূলিত সত্তার সঙ্গে প্রদীপ চরিত্রের এক অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষণীয়। দুটো চরিত্রই তাদের চেতনায় বহন করেছে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, উন্মূলিত সত্তায় গভীর হাহাকার। ইফতিখারের চেতনায় বার বার শৈশবে দেখা লক্ষ্মৌ শহর প্রেতের মতো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে হানা দেয়। তবু এর চাইতেও প্রবলভাবে তাকে নস্টালজিক করে তোলে পুরান ঢাকার মাদকতা। ফারুকের কথার সূত্র ধরে মধ্যরাতের নবাবপুর তথা পুরান ঢাকাকে চেতনায় জায়গা করে দিতে সে ডুব দেয় অন্তঃসত্তায়। চেতনার গহীন গাঙ থেকে সে ছিঁড়ে আনে স্মৃতিময় পুরান ঢাকাকে, তুলে আনে বিষণ্ণতামাখা ঠাঁটারি বাজার, আমজাদিয়া, কাওয়ালির আসর, রথখোলার মোড়, বন্ধুদের আন্তরিক সান্নিধ্য। 'নস্টালজিয়ায় কাত হয়ে ইফতিখারের বমি বমি লাগে।' মূলত ইফতিখার, সমরজিৎ—এই চরিত্রগুলো ইলিয়াসের প্রতিরূপ, যিনি নিজেই পুরান ঢাকায় জীবন কাটিয়েছেন, আত্মস্থ করে নিয়েছেন এর স্বভাবস্বর ও সংস্কৃতিকে। কাজেই তিনি নিজেই যেখানে নস্টালজিয়াকে চেতনায় ধারণ করেছেন, সেখানে স্বভাবিকভাবেই তাঁর চরিত্রগুলো বহন করবে তাঁর অন্তর্ভাবনা, সেটাই স্বাভাবিক।

চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যকর্মে চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখানো লেখকের অন্বিষ্ট নয়। চরিত্রচিত্তই মুখ্য এ ধরনের রচনায়। সেদিক থেকে একটি চরিত্রের চেতনাংশের প্রবহমান স্বভাবস্বর, তার অতীত ও বর্তমান কিংবাা ভবিষ্যৎ কালপরিক্রমণই গল্পে প্রাধান্য পায় সর্বাগ্রে, যেমনটি পেয়েছে ইলিয়াসের গল্পে। ইলিয়াস তাঁর গল্প কাঠামোতে বার্গসঁর মনস্তাত্ত্বিক সময়-ধারণাকে প্রোথিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের রচনায় কোনো একটি বাস্তব অনুষঙ্গের অভিঘাতে একটি চরিত্র চেতনায় পরিভ্রমণ করে অতীত খুঁড়ে বের করে আনে ওই অনুষঙ্গজাত স্মৃতিরাশিকে। প্রুস্তের হারানো সময়ের সন্ধানে *[Remembrance of Things past*, উপন্যাসের কথককে যেমন এক টুকরো কেকসদৃশ বাস্তব অনুষঙ্গ ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার শৈশবে, কিংবা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* উপন্যাসে খগেন্দ্রনাথ চরিত্রটি স্ত্রী সাবিত্রীর শেষকৃত্যের শোকে অবগাহন করতে করতেই তার রূপসী শরীরের সুগন্ধকে আগুনের তাপে দুর্গন্ধে পরিণত হতে দেখে উপলব্ধি করে সেই গন্ধ ভাতের ফেন পোড়া গন্ধসদৃশ, যা তাকে জীবিত সাবিত্রীর সঙ্গে যাপিত দাম্পত্য জীবনের বিগত দিনগুলোর স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় প্রুস্তের কথক কিংবা খগেন্দ্রের মতো ঠিক এমন করেই ব্যক্তি-মানসসত্তা চেতনায়, এক পলকে যাপন করে নেয় দূরাগত অতীতের দিনগুলো, কখনো কখনো এক জীবনকালকেও। আবার কখনো কখনো একটি চেতনসত্তা শ্রুতি কিংবা স্মৃতির মধ্য দিয়ে অবগাহন করে তার পূর্বপুরুষের চেতনাস্রোতে। ইলিয়াসের হানিফ, সমরজিৎ কিংবা লালমিয়ার চেতনস্তরে খেলা করা অতীত স্মৃতিকে এভাবেই ইলিয়াস গল্পে ফ্রেমবন্দি করেন।

ইলিয়াসের পুরান ঢাকাকেন্দ্রিক 'ফেরারী' গল্পে মাত্র একদিনের কাল পরিসরে বিন্যস্ত হয়েছে হানিফের যৌবন এবং একই সাথে পিতা ইব্রাহিম ওস্তাগরের জীবৎকাল। পিতার

জিন-পরী দেখার অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের অভিঘাতে আবেগায়িত হানিফ স্মৃতি-কল্পনা-শ্রুতির মিথস্ক্রিয়ায় নিজের চেতন সত্তায় একাকার করে ফেলে বৃদ্ধ পিতা ইব্রাহিমের চেতনাভিজ্ঞতা। পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের অতিলৌকিক আবহ হানিফের মানসচেতনায় জাগ্রত করে দেয় এক প্রগাঢ় ভীতিবোধ। মনে পড়ে এই পার্কের পাশেই তার পিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কবন্ধ আর 'খাবসুরাত শাহজাদী'র, পিতার অনুরণিত কণ্ঠস্বর তার চেতনায় বেজে ওঠে :

> হেইদিন খিজিরে আমাকে কইয়াও ভি গেলো, "তাজমহলের মইদ্যে 'পুকার' খেলতাছে, ল যাই সেকেন শো মাইরা দেই"। মগর খিজিরের লগে গেলাম না'। কতোকাল আগেকার সেইসব শীত গ্রীষ্ম এবং সেইসব রৌদ্র ও রাত্রি। ইব্রাহিমের তখনও বিয়ে হয়নি, বাপও বেঁচে ছিলো। [ফেরারী]

হানিফের চেতনার গহন ভেতর যেন দখল করে নেয় ইব্রাহিম ওস্তাগরের চেতনসত্তা। পিতার চেতনাংশ দিয়েই সে যেন অনুভব করে আন্টাঘর, ভিক্টোরিয়া পার্ক, এবং পার্কের শরীরে জড়ানো অতিপ্রাকৃতের গন্ধ, আগ্রা-লক্ষ্মৌ-এর ঐতিহ্য-নিঃসৃত পুরান ঢাকার চালচিত্র। আবেগায়িত সত্তায় তার উপলব্ধি :

> আউজকা ঘরের মইদ্যে শাহজাদীরে দেইখা দুষমুন কবন্ধটারে দেইখা বাবায় মনে লয় উন্নিশ বচ্ছরের জোয়ান মরদাটা না হইয়া এক্করে সিধা খাড়াইয়া পড়বো। উনিশ বছর বয়সের ইব্রাহিমকে মনে পড়ে যাওয়ায় হানিফের চোখ মুখ, গাল, কান, কপাল এমনকি করোটি ও চুলেও ঝিরিঝর হাওয়া বইতে শুরু করে। এই ধরনের স্পর্শের সঙ্গে সে কি পরিচিত? বর্ষাকালে থৈ থৈ জলভরা দোলাই খালে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ জেগে উঠে নিশ্বাস নেওয়ার স্মৃতিতে হানিফের নাক মুখ শির শির করে ওঠে। গ্যান্ডারিয়া লোহার পুলের রেলিঙ থেকে ডাইভ দিয়ে কতোবার সে স্পর্শ করেছে জলের তল, ভেসে ওঠবার পরও জলের ভেতরকার শাঁসের বায়ুহীন আলোহীন আচ্ছন্নতা কিছুতেই ছাড়তে চায়না ওকে, নাকের ডগাটা তখন জ্বলে; অপরিচিত মিষ্টি কষাটে স্বাদে মুখের ভেতরে টাকরায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে, মনে হয় পিপারমেন্ট দেওয়া লজেন্স চুষেছে অনেকক্ষণ ধরে। কানের পেছন দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া ধাক্কা দিলে ওপরে তাকিয়ে দ্যাখে লোহার পুলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ঝরঝরে বাস; পেছনে ঘোড়ার গাড়ি ছাদে, চাবুক রাখতে উঠে বসছে ইব্রাহিম। শাহজাদীকে রেলিঙের পাশে ফেলে রেখে ঘোড়াদুটো ছুটতে শুরু করলো, ইব্রাহিম পেছনে তাকাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ি গড়িয়ে চলে যাচ্ছে কেশব ব্যানার্জী রোডের দিকে। কিন্তু লোহার পুলের রেলিঙ ধরে খালের জলে ছায়া ও আগুন ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে শাহজাদী। কবন্ধ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেলে তার হাত ছুটে রেলিঙ গড়িয়ে শাহজাদী পড়ে গেল দোলাই খালের ঘোলা জলে। সেখানে হানিফ ও হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান শুধু সাঁতার কাটে। [ফেরারী]

পিতার যৌবনের এইসব উপাখ্যানের শেকড় হানিফের অন্তর্মানসে এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, যে তাকে ওপড়ানোর সাধ্য কারো নেই। এ কারণেই হানিফ এবং হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান 'দোলাই খালে' সাঁতার কাটে। এটি, মূলত বলা যেতে পারে, দোলাই খাল সদৃশ হানিফের চেতনা, যেখানে হানিফ এবং তার যুবক পিতার চিন্তনস্রোত একাকার হয়ে বহমান। শুধুমাত্র চেতনাপ্রবাহরীতির মাধ্যমেই হানিফ এবং হানিফের সমবয়স্ক পিতার চেতনাস্রোত সমান্তরালে প্রবহমান হতে পেরেছে। এভাবে এক

চেতনার মধ্য দিয়ে অন্য এক ব্যক্তিচেতনার নিবিড় রূপকল্প নির্মাণ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *Mrs. Dalloway* এবং জেম্‌স্ জয়েসের *Finnegans Wake*-এর কথা। এ গ্রন্থগুলোতে স্বপ্ন এবং কল্পময়তার মধ্য দিয়ে একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রের চেতনা বা মনোজগতে অনুপ্রবেশ করে চেতনার বহুত্বকে প্রকাশ করেছে। ইলিয়াসের এই গল্প যেন সেই উত্তরাধিকারই বহন করেছে। পার্থক্য এটাই, ইলিয়াসের এই গল্পে কোনো স্বপ্নময়তা বা কল্পনার মিশেল নেই, হানিফের চেতনা গল্পে যুবক পিতার মুখনিঃসৃত গল্পকথার ভেতর অনুপ্রবেশ করেছে।

চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যকর্মে চরিত্রের অন্তর্জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুখ্য হয়ে ওঠে লেখকের কাছে। ইলিয়াসের 'উৎসব' গল্পেও পাঠক আনোয়ার আলির চেতনার সতত পরিবর্তনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তার দোলায়িত মানসসত্তার সঙ্গে পরিচিত হন। এ গল্পে আনোয়ার আলি নিম্নবিত্ত বলয় থেকে উচ্চবিত্ত বলয়ে উত্তরণের স্বপ্ন লালন করেছে চেতনায়। হয়ত একারণেই আজন্ম পরিচিত গণ্ডির প্রতি ক্ষুব্ধ আনোয়ার এলিট শ্রেণির একজন হয়ে ওঠার অবদমিত আকাঙ্ক্ষার টানাপড়েনে চেতনসত্তায় বহন করেছে এক প্রবল দোলাচল, যার অভিঘাতে তার অন্তর্মানসে বার বার হানা দিয়ে গেছে বিগত সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর ধানমণ্ডি, তার চওড়া-মসৃণ দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে রোদ পোহানো বিলাসী রাস্তা, এলিট শ্রেণির নারীদের মোহনীয় প্রসাধনে সজ্জিত শরীর, কথা বলার ভঙ্গি, হাসির টুকরো, লোভাতুর কটাক্ষ—সর্বোপরি তাদের আবেদনময়ী সত্তার প্রগাঢ় হাতছানি। তাই বাড়ি ফেরার পরও পুরান ঢাকার সমান্তরালে এলিট শ্রেণির মোহময় জগৎ তার চেতনায় 'ছিঁড়ে ছিঁড়ে... লাল লাল রেখায় চোখ টেপে', বর্তমানের যাপিত জীবন এবং বিগত সন্ধ্যেবেলার আলো ঝলমলে আকাঙ্ক্ষিত জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয় আনোয়ারের চেতনায় সমান্তরালে :

> রূপসীর কণ্ঠ, নেত্রকোণ ও ঠোঁটে ছায়াছবির পর্দা কাঁপে, 'মাইগড! আই এম এ্যাফরেড অফ পলিটিশিয়ান্স... আনোয়ার আলি ও সালেহা বেগমের ছেলে কলি একটা পা তুলে দিয়েছিলো তাদের মেয়ে পলির গায়ের ওপর।... ছেলে মেয়ে অঘোরে ঘুমায়। বাইরে দ্বৈতকণ্ঠে কারা আরমান চলচ্চিত্রের একটি গানের একটুখানি গেয়েই থেমে গেলো। সালেহা ফ্যাসফ্যাসে গলায় কি বলে, আনোয়ার আলি তার কথাও শোনে, কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা মিসেস ইরশাত হোসেন চৌধুরীর গুঞ্জরণও তার কানে বাজে।... মিসেস চৌধুরীর চেহারা একটুও মনে নেই। তার সংলাপ সবই স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু চেহারা কোথায়? মেয়েটাকে কতো মনোযোগ দিয়ে দেখলো এদিক থেকে দেখলো, ওদিক থেকে দেখলো, কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই সমস্ত ভুলে বসে আছে।... আনোয়ার আলি খুব জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এই দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত উৎসব একটু উড়ে গিয়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে যায়। [উৎসব]

আনোয়ার আলির এই দীর্ঘশ্বাস তাকে বর্তমানের ক্রূর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধানমণ্ডির 'উৎসবের মহিলারা... দূরেই রয়ে যায়'; সেই সঙ্গে ধানমণ্ডি আর পুরান ঢাকার সাংস্কৃতিক ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে তার চোখে। অন্যদিকে ধানমণ্ডির উৎসবে উপস্থিত পুরনো বন্ধুদের সান্নিধ্য একই সমান্তরালে এ গল্পে ছায়াপাত ঘটিয়েছে আনোয়ারের কলেজ জীবনেরও। চমৎকার দক্ষতায় ইলিয়াস একটি সন্ধ্যারাতের পরিসরে আনোয়ারের যাপিত জীবনাভিজ্ঞতার কয়েকটি স্তরকে তুলে এনেছেন গল্পে। অতীত ও বর্তমান সময়পটের মিথস্ক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে গল্পের কাঠামো :

> কে কাইয়ুমের বেশি কাছে ঘেঁষতে পারে, এই নিয়ে হাফিজের সঙ্গে ওর একটু প্রতিযোগিতামতো ছিলো। ওকে দেখে দশ বছর পর সেই ঈর্ষাবোধ কিলবিল করে উঠলো। প্রথম যখন কলেজে ভর্তি হয়, হাফিজ তখন একটু গ্রাম্য ধরনের ছেলে, উচ্চারণে আঞ্চলিক টান এখনো কানে বাজে। .... উৎসবের রূপসীরা চোখের সামনে আসে, ফের চলে যায় কিন্তু হাফিজের আত্মজীবনী পাঠ বিরতিহীন.... আনোয়ার আলির এক হাত তখনো প্যান্টের ওপর রাখা, এক হাতে খামচে ধরে আছে নরম আন্ডারওয়্যার। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টে উচ্চকণ্ঠে লতা মুঙ্গেসকর বাজে, রেকর্ডে অধ্যাপক ও গীতিকার হাফিজুর রহমানের আত্মজীবনী শোনা যায়। আনোয়ার আলি এদিক দ্যাখে, ওদিক দ্যাখে, মেয়ে কোথায়, ভালো ভালো মেয়েদের খুব ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। [উৎসব]

গল্পে ঘটনাপরম্পরা ও কালপরম্পরা ভেঙে মুখ্য করে তোলা হয়েছে আনোয়ারের অন্তশ্চেতনার পরিব্রাজক সত্তাকে। আনোয়ার আলির মতোই চরিত্রের অন্তর্মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে ইলিয়াসের 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে, যেখানে রমিজ আলির বিপর্যস্ত চেতনার অন্তরঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন ইলিয়াস। বোন অসিমুন্নেসার আত্মহত্যা-সংবাদের অভিঘাতে রমিজ আলির চেতনা অতীতচারী হয়ে ওঠে। অসিমুন্নেসার স্মৃতিরা অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে তার মানসজগতে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রমিজের চেতনায় অদ্ভুতভাবে সায়েবের কন্যা শাম্মী এবং অসিমুন্নেসা একাকার হয়ে যায়, তীব্রভাবে তার চেতনায় ধরা পড়ে দুই নারীর মধ্যকার আকাশপ্রমাণ শ্রেণি ব্যবধান :

> সায়েবের মেয়ে লাফ দিয়ে উঠে ড্রইং রুম পেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকে রেফ্রিজারেটার খুলে বোতল বার করে ঢকঢক করে পানি খায়।... মেয়ে ফের ভেতরে যায়, বেরিয়ে আসে লিচুর গোছা হাতে। ১টা লিচুর বোঁটার দিকে খোসা ছাড়িয়ে ঠোঁট জোড়া ছুঁচালো করে সবটা লিচু সে মুখের ভেতর টেনে নেয় চুকচুক আওয়াজ করে। এই চুকচুকটা এমনি তীক্ষ্ণ যে শুধু লিচু খেয়ে সায়েবের মেয়ে এর ধার ক্ষয় করতে পারে না, অসিমুন্নেসার তেঁতুল চোষাতেও এর প্রতিধ্বনি সমান জোরে বাজে। তাই এই বাড়িতে এই কার্পেটে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে অসিমুন্নেসা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার চুকচুক আর চটাৎ চটাৎ তেঁতুল খাওয়া আর থামে না। ম্যাট্রিক পাস কী যে রঙের কথা বলে আর তাই শুনে অসিমুন্নেসা চলকে চলকে হাসে। অ বুবু মায়ে ডাকে... বাঁশের থামের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে রমিজ। ধলেশ্বরী থেকে বাতাস আসে। ইলিশের গন্ধ চোঁয়ানো বাতাসে রমিজের খিদে পায়। বুবুর লালচে-কালো চুল ওড়ে পাটের ছেঁড়া আঁশের মতো। বুবুর সাড়া পাওয়া যায় না। [কীটনাশকের কীর্তি]

'চা দাও'—বিবি সায়েবের এই আদেশে রমিজ চমক ভেঙে চৈতন্যের গহীনে খেলা করা প্রবহমান চিন্তাস্রোতে অবগাহন মুলতবি রেখে ফিরে আসে বর্তমানে। চেতন্যপ্রবাহরীতিতে চিন্তাস্রোতে কোনো যৌক্তিক শৃঙ্খলা থাকে না। এই গল্পেও নেই কোনো কার্যকারণ শৃঙ্খলা। চেতনার সার্বক্ষণিক দোলাচলে অতীত-বর্তমান সমান্তরালে বহমান এ গল্পে। ফলে রমিজ আলির চেতনায় বুবু অসিমুন্নেসার স্মৃতিরা আনাগোনা করলেও বিবিসায়েবের এক আদেশেই সে বর্তমানে ফিরে আসে। মনে পড়ে দেশ থেকে সদ্য আসা পিতার চিঠিতে বুবু অসিমুন্নেসার আত্মহত্যার কথা, মনে পড়ে সায়েবকে বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু কিছুই বলা হয় না। এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সময় কাটে তার। ঘোরের মধ্যেই র‍্যাটমের প্যাকেটের ওপরকার ছাপানো রঙিন ছবিতে পোকামাকড়ের মৃত মুখ ও শরীরের পাশে অসিমুন্নেসার মৃত মুখ দেখে সে। এক সময় বুবুর প্রতি প্রবল ঘৃণা বোধ করে রমিজ

মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিক পাশের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা কল্পনা করে। তার চেতনায় একে একে ভিড় করে অসিমুন্নেসা, মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিক পাস, হাফিজুদ্দিনের সঙ্গে অসিমুন্নেসার বিয়ে, বিয়ের পর বিচ্ছেদ—এই সব স্মৃতি। অসিমুন্নেসার স্মৃতি এবং ক্ষোভ রমিজকে শাম্মীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। কেননা সে প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি করে, অর্থনৈতিক ব্যবধান এবং শ্রেণি বৈষম্যই শাম্মী ও অসিমুন্নেসাকে পৃথক পরিণতি দিয়েছে। প্রতিশোধস্পৃহায় উজ্জীবিত রমিজ আলি পুরুষ কর্তৃক অত্যাচারিত অসিমুন্নেসার আত্মহত্যার প্রতিবাদে এবং একই সঙ্গে বুবুকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় র‍্যাটমের প্যাকেটের সমস্ত ঔষধ সায়েবের মেয়ের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে বুবুর পরিবর্তে পোকামাকড়ের মৃত জগতে পাঠাতে চায় তাকে :

> রমিজের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। এক হাতে পোকা মারা ওষুধ।... সময় বয়ে যায়। তার মাথায় তেঁতুল গাছের ঝাঁকড়া শরীর, পাটখেতে বিলি কাটতে কাটতে সমুখে উপড়ে ফেলা দাদার হাতে লাগানো কাঁঠাল গাছের লুপ্ত ছায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মিরধা বাড়ির ম্যাট্রিক পাস। মগরেবের আজানে অন্ধকার গাঢ় হয়। বুবু কৈ যাও? ও বুবু! বুবুকে ডাকতে ডাকতে তার গলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। বুবু নাই—জ্যাতাও নাই, মরাও নাই। রমিজের মাথা ভার হয়ে আসছে ... না আর না। সায়েবের মেয়ের ঠোঁটের সুড়ঙ্গ দিয়ে সমস্ত ভার গলিয়ে না দিলে বুবুকে ঠাঁই দেবে সে কোথায়? [কীটনাশকের কীর্তি]

সমাজ কর্তৃক বঞ্চিত মানুষের চেতনায় জন্ম নেয় প্রবল ক্ষোভ যা তাকে করে তোলে প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহার অবদমন তার চেতনায় জন্ম দেয় অসুস্থতা, যে অসুস্থতায় সে নিজেকে গুটিয়েও ফেলতে পারে, আবার নিজের ক্ষোভকে সে বিস্ফোরিতও করতে পারে। 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে রমিজ চরিত্রটি নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে চেতনার ঘেরাটোপেই বন্দিত্ব বরণ করেছে। রবীন্দ্রগুপ্ত লিখেছেন, "যারা চেতনাপ্রবাহরীতির ধারক, তাদের মধ্যে প্রুস্ত এবং জয়েস দুজনেই স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ ছিলেন না।... এই দুই লেখকের ব্যক্তিগত অপূর্ণতা থেকে চেতনাপ্রবাহরীতির উত্তরাধিকারে কয়েকটি অপূর্ণতা দোষ দেখা যায়। চেতনাপ্রবাহরীতি সুস্থ-সুখী প্রাণোচ্ছল মানুষকে দেখে না" ।২১ রবীন্দ্রগুপ্তের এই মতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, চেতনাপ্রবাহরীতিতে যেসব ব্যক্তিমানুষের চেতনাকে ধারণ করা হয়, তাদের অধিকাংশই সমাজবিবিক্ত নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত অসুস্থ মানবসত্তা। কারণ 'সীমাহীন নিঃসঙ্গতাই জন্ম দেয় উন্মত্ততা বা সিজোফ্রেনিয়া'র২২ যা প্রগাঢ়ভাবে অনুভূত হবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রঞ্জুর মধ্যে। 'উৎসব' গল্পের আনোয়ার আলি যেমন এলিট শ্রেণির একজন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা অবদমনে মানসিকভাবে দ্বিধা দোলাচলে কাল কাটায়, তেমনি স্বভূমি, স্ববলয়চ্যুত হয়ে অনিকেত চেতনার নেতিবাচকতা বহন করে প্রদীপ চরিত্রটি। 'ফেরারী' গল্পে হানিফ চরিত্রের পলায়নপরতা কিংবা 'খোঁয়ারি' গল্পের সংখ্যালঘু সমরজিতের মনোবেদনা তাদের শ'খানেক বছরের পুরোনো বাড়ির প্রতি একাত্তর-পরবর্তী তথাকথিত বিনষ্ট রাজনীতির ধারক ও বাহকদের লোলুপতার অভিঘাত তাকে বাধ্য করে স্বচেতনায় অস্তিত্বহীনতার যন্ত্রণা বহনে। এই অস্তিত্বহীনতা কিংবা নৈঃসঙ্গ্যচেতনা বা সমাজ-বিচ্ছিন্নতা অথবা আকাঙ্ক্ষা অবদমনের অভিঘাতে ইলিয়াসের চরিত্রগুলো চেতনার বিবরে বাস করেছে, আঁকড়ে ধরেছে স্মৃতিকে, মুখ্য হয়ে উঠেছে অন্তর্বাস্তবতাই। তবে ইলিয়াস শুধু যে তাদের অন্তশ্চেতনাকেই গল্প শরীরে প্রোথিত করে দিয়েছেন তা নয়, বরং তাদের প্রবহমান চেতনার পাশাপাশি তিনি

সমাজবাস্তবতার নানা মাত্রা নিয়েও কথা বলেছেন। সেদিক থেকে তাঁর চরিত্রগুলো কোনোভাবেই খণ্ডিত নয়। অন্তর্বাবস্ততা ও বহির্বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর চরিত্রগুলো পূর্ণতা পেয়েছে।

ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পগুলোতেও চেতনাপ্রবাহরীতি অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। 'খোঁয়ারি' গল্পে মাত্র একদিনের কালপরিসরে চমৎকারভাবে চরিত্রচেতনায় উঠে এসেছে পুরান ঢাকার বিলুপ্তপ্রায় অতীত ঐতিহ্যের পাশাপাশি একাত্তর এবং একাত্তর পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার নানা চিত্র। এ গল্পে বর্তমান ও অতীতের মিথস্ক্রিয়া সমরজিৎ কিংবা ইফতিখারের চেতনাজগৎ নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। একই গল্পে কয়েকটি চরিত্রের চেতনাজগতের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিসর্পিল গতি ধারণ করার বিষয়টি চেতন্যপ্রবাহরীতির সাহিত্যকর্মে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে যেমন চারটি চরিত্রের অন্তর্জগতের খোঁজ মেলে, তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* উপন্যাসে মেলে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পটে চারটি চরিত্রের অন্তশ্চেতনার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। একইভাবে 'খোঁয়ারি' গল্পেও পাঠক সমরজিৎ কিংবা ইফতিখারের মানসচেতনার সঙ্গে পরিচিত হন। এই গল্পে পুরান ঢাকার এককালের বনেদি সংখ্যালঘু একটি পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতার ছবি একেঁছেন ইলিয়াস। গল্পের চরিত্রগুলোর চৈতন্যাবগাহনে পুরান ঢাকা তার লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী সত্তাসহ অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই সংখ্যালঘু সমরজিৎ এবং তার পিতা অমৃতলাল সত্তা টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে যেন তাদের শ'খানেক বছরের নড়বড়ে বাড়ির প্রতিরূপ। তবু একাত্তর-পরবর্তী সুবিধাবাদী রাজনীতির সঙ্গে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে হার মানে না তারা। সমরজিৎদের এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটির শরীরে প্রোথিত হয়ে আছে পুরান ঢাকার অতীত সৌগন্ধ আর তাদের আজন্ম পরিচয়ের শেকড়। মদ্যপ সমরজিতের খোঁয়ারি মানসচেতনায় বার বার হানা দেয় কতকাল আগের পুরনো গন্ধমাখা ঠাকুরদার নাটমন্দির, পূজার সময়কার জমজমাট মেলা, চামারটুলির যমুনাবালা—সন্তোষকাকা, নবাববাহাদুর, বড়ো বাড়ির স্বপ্নময় স্মৃতিরা। গল্পে তথাকথিত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের অফিস হিসেবে বাড়ি বিক্রির অভিঘাতে খোঁয়ারি সমরজিতের ভেতরে প্রোথিত স্মৃতিরা যেন বিদ্রোহ করে একের পর এক বেরিয়ে আসে চেতনার এলোমেলো পদচারণায় :

> সমরজিতের বড়ো ইচ্ছা করে, যাইনা, বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াই! 'তো তুমি কি ডিসাইড করলে? তোমাদের বাড়িটা আমাদের দরকার'। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াবার জন্য সমরজিৎ উসখুস করে। দক্ষিণের এই বারান্দার নিচে তাকালে চোখে পড়ে ইটপাটকেলের ছড়ানো স্তূপ। এককালে ওর ঠাকুরদার নাটমন্দির ছিলো এখানে। সমরজিতের ছেলেবেলাতেও পূজার সময় গলির এ মাথা ও মাথা জুড়ে মেলা বসে যেতো। চামারটুলির ঐ কোণের দোতলা বাড়ি থেকে আসতো যমুনাবালার লোক। ছেলেবেলায় কতবেল কি বিলেতি আমড়া চুরি করতে সমরজিৎ কখনো কখনো ওদের বাড়িতে গিয়েছে। যমুনাবালা তাকে দেখতে পেলে বরং ডেকে ঘরে বসতে দিতো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সেই ঘরে কার্পেটের আসনে বসে দুধ মুড়ির ফলার খেতে খেতে সমরজিৎ যমুনাবালার মুখে কত গল্প শুনেছে,... তাদের পূর্বপুরুষের গল্প।... ঠাকুরমা কতো বড়ো ঘরের মেয়ে, ভাগ্যকূলের কত মানী লোক ওরা। ঠাকুরদার বাবা ঠাকুরদার বিয়ের সময় সমস্ত ঢাকা শহর মাৎ করে দিয়েছিলো... ছেলেরা কি বলেছে তোমার বাবা বুঝতে পারেননি।... যমুনাবালা, চামারটুলির বড়োবাড়ি, ছোটোবাড়ি, সন্তোষ কাকা—ডানহাতে সবাইকে ঠেলে দিয়ে বাঁ হাতে সমরজিৎ মাথা চুলকায়...। [খোঁয়ারি]

গল্পের এই অংশে একই সাথে দুটো কণ্ঠস্বর অনুরণিত হয়েছে, একটি ফারুকের বর্তমান কণ্ঠস্বর এবং অপরটি সমরজিতের চেতনাশ্রিত অতীত কণ্ঠস্বর। অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন সৃজনে লেখক এখানে তুলনারহিত। সমরজিতের চেতনায় প্রবহমান কতকালের স্মৃতিরাশির গান স্বরিত, যা উবে যায় ফারুকের কথায়, বর্তমানে ফেরে সে। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। ফারুক যখন 'অকুপেশন পিরিয়ডে' সমরজিতের পরিবারের 'সাফারিংস'-এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তখন সেই কথার সূত্র ধরে যুদ্ধের দিনগুলো তার করোটিকে, তার চেতনাকে আন্দোলিত করে তোলে। চোখের সামনে যেন চলচ্চিত্রের মতো ভেসে ওঠে সমরজিতের পরিবারের ভয়ার্ত মুখগুলো। চোখে পড়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে যুদ্ধ-ক্ষতাক্ত, দগ্ধ জনপদ, ঝলসানো গাছপালা, 'নদীতে গুলিবিদ্ধ ফেঁপে ওঠা লাশেদের জলকেলি।' একাত্তরের বিশাল সময়পট সমরজিতের চেতনায় ছায়া ফেলে এক চিলতে সময়ের আধারে, যাকে ইলিয়াস চিত্রল করে তুলেছেন ন্যারোটিভ মনোলগের সাহায্যে:

> ফারুকের কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সমরজিতের শরীরের রক্ত উজানে উঠে বসে তার করোটির ছাদে, ছাদের বীমে এবং মেঘ হয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে অবশেষে বৃষ্টিপাত শুরু করে। এই বৃষ্টির উৎস করোটির মেঘ, করোটির মেঘের উৎস তার শরীরের রক্ত। সুতরাং বর্ষণের রঙও লাল। অবিরাম লাল বৃষ্টিপাত চোখের সামনে একটি সীমাহীন জলপর্দা টাঙিয়ে দেয়। পর্দায় দ্যাখা যায়, হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সমরজিৎও পালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে পালিয়ে প্রথমে কমলাঘাটের কাছে একটি গ্রাম, শটি বাড়ি। প্রথম কয়েকটা দিন কাটলো কানাই ঘোষের পেঁয়াজ, রসুন ও শুকনো লঙ্কার আড়ত আছে, সেখানে...। কিন্তু গোয়ালঘুর্ণীর ঘাটে থামতে না থামতেই মেঘ করে এলো... তীব্র বেগে বৃষ্টি পড়ে ... বাতাস জল গাছপালা ও বিক্ষুব্ধ ধ্বনিপুঞ্জও পরিণত হচ্ছে একটি সজ্ঘবদ্ধ গর্জনে। বাতাস ও জল উথাল পাতাল মাথা কোটে; এরা এখন কোনদিকে যায়? সমরজিৎ তখন ক্ষণে ক্ষণে কেবল আকাশের দিকে তাকায়... 'কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপল?' এই বাক্য শোনা গেলো আকাশের নিভৃত খাপ থেকে — এই ভয়ে সমরজিৎ চমকে উঠে দ্যাখে, না কথা বলছে ফারুক... কতোদিনের ওপার বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী শীতলক্ষার ওপার গোয়ালঘুর্ণী ঘাটে বিদ্যুৎ চমকায়। মানুষের সমবেত চিৎকারের ধ্বনি সমরজিতের পাছায়, সমরজিতের বুকে লাথি মারে। 'আমি বলি দোস্ত, বাড়িটা ছেড়ে দাও।...[খোঁয়ারি]

একাত্তরে সমরজিতের পরিবার সম্পর্কে ফারুকের 'অকুপেশন পিরিয়ডে তোমাদের 'সাফারিংস'র কথাও তো জানি' এই উক্তির পরে হয়ত একটি তুচ্ছ মুহূর্ত কাটার পর সে উচ্চারণ করেছে 'কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপল?' কিন্তু সেই একটি তুচ্ছ মুহূর্তই সমরজিতের চেতনার জন্য যথেষ্ট। ওই তুচ্ছতম মুহূর্তেই পুরো একাত্তর অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে সমরজিতের চেতনার রক্তক্ষরণে। অসাধারণ দক্ষতায় লেখক এক চিলতে মনস্তাত্ত্বিক সময়গহ্বরে সমরজিতের অন্তর্মানসে প্রোথিত করে দিয়েছেন ন-মাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *Mrs. Dalloway* উপন্যাসে ড্যালওয়ের অন্তর্মানসে ভিড় করা যুদ্ধক্ষতাক্ত পিটার ওয়ালশ আর ওয়ারেন স্মিথের স্মৃতিদের কথা। বাংলা সাহিত্যে একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলো লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্মানসে প্রবল অভিঘাতের জন্ম দিয়েছে, ইলিয়াসও এর বাইরে নন। তাই একাত্তর এবং একাত্তর-উত্তর অবক্ষয়ের চিত্র রূপায়ণে ইলিয়াস অতীত ও বর্তমানকে সমরজিতের চেতনায় সমান্তরালে প্রবহমান করে তুলেছেন। হাসান আজিজুল হক-এর 'আমরা অপেক্ষা করছি' শীর্ষক গল্পেও এরকম অতীত

ও বতর্মানের মেলবন্ধন লক্ষ করা যাবে, যেখানে পাঠক একাত্তর-পরবর্তী সর্বহারা রাজনীতির কর্মী তারেক ও বুলেটবিদ্ধ রুনুর মনোযন্ত্রণা, হতাশা এবং দেশ নিয়ে তাদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। গল্পে তারেকের চেতনাস্থিত চিন্তনস্রোতে যুদ্ধের স্মৃতি এবং যুদ্ধোত্তর বর্তমান সমান্তরালভাবে বহমান। দশবছর সময় পরিসরকে হাসান আজিজুল হক এক রাতের সময়-পর্বে বিন্যস্ত করেছেন স্মৃতি অনুষঙ্গের দ্বারা :

> আমরা অপেক্ষা করতে থাকি... আট বছর আগে ঠিক এমনি করেই একদিন সন্ধেবেলায় আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।... সন্ধেবেলায় আমরা দুজন, তখন বর্ষাকাল, একাত্তর সালে সকাল সকাল বর্ষা এসেছিলো, আকাশ মুখ নামিয়েই ছিলো, তাতে বাংলাদেশের নরম মাটিতে পাকিস্তানি বাহিনীর খুবই অসুবিধা হয়েছিল... আজকের মতো খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে। [আমরা অপেক্ষা করছি]

আট বছর পর পুরো একাত্তর আবারো তারেকের চেতনায় অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে এ গল্পে।

ইলিয়াসের 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পটিতেও একাত্তর এবং একাত্তর-পরবর্তী কাল সমান্তরালে বহমান লালমিয়া চরিত্রের মানসচেতনায়। চেতনাপ্রবাহরীতির সাহিত্যে প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহার লক্ষণীয়; ইলিয়াসের এই গল্পে সেই প্রতীকী পরিচর্যার ব্যবহার ঘটেছে 'বুলেট' চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে। গল্পে চেতনাপ্রবাহরীতি ব্যবহার করে লেখক অন্যতম প্রধান চরিত্র লালমিয়ার মনোগহনে লুকানো চিন্তারাশির প্রকাশ ঘটিয়ে চমৎকারভাবে তার স্বপ্নবয়ান, ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের প্রতি তার ক্ষোভ মিশ্রিত অব্যক্ত অভিমান, যুদ্ধের ডামাডোলে পাকিস্তানের দালাল রাজাকার নাজির আলির ফুলে ফেঁপে ওঠার কদর্য ইতিহাস এবং তার পাশাপাশি লালমিয়ার স্বপ্নে বার বার হানা দেয়া পেছন ফেরানো পায়ের পাতাবিশিষ্ট মুসুল্লির প্রতীকে একাত্তরের পশ্চাৎপদ মনোভঙ্গিসম্পন্ন দালাল রাজাকারের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পের শুরুতেই স্বপ্নবয়ানের ক্রমিক ধারাভাষ্যে লালমিয়া বুলেটের স্বপ্নবাণে জর্জরিত হতে হতেই অতীতে ফিরে গেছে, ফিরে গেছে বুলেটের পিতা তার ছোটবেলার বন্ধু ইমামুদ্দিনের কথায় :

> ...এই বুলেট ছোঁড়াটা কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ হলে কী হয়, লালমিয়ার স্বপ্নের খুঁটি নাটি ভুল ধরতে সবসময় ওঁৎ পেতে রয়েছে আস্ত খচ্চরটা। তা বুলেটের আর দোষ কী? বাপটা কি ছিল? লালমিয়ার রাগ হয় বুলেটের বাপের ওপর ... রথ খোলার মোড়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে পালাবার সময় মিলিটারির গুলিতে সে ধপাস করে পড়ে গেল বংশালের মাথায়। ও দিকে ঐ রাস্তায় ছুটতে গেল কোন আক্কেলে? ... নতুন দখল করা লন্ড্রি, লন্ড্রির একমাত্র কর্মচারী লালমিয়া রাতে তখন লন্ড্রিতেই থাকে। গ্রেনেড ছুঁড়ে ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে ও এক মিলিটারি জখম করে ইমামুদ্দিন কোনমতে যদি তার ঘরে একবার পৌঁছে যায় তো লালমিয়া কি ময়লা কাপড়ের স্তূপে তাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনা? ... তাদের বন্ধুত্ব কি আজকের নাকি? বলতে গেলে জন্মের পর থেকে দুজনে দুজনকে চেনে। রায়সাবাজার হলের ওপর মসজিদে হাফিজুল্লা মুনসির কাছে কায়দা আমপাড়া পড়া শুরু করে মাঝখানে খান্ত দেওয়া, বড়ো হতে হতে এর ছাদে ওর ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ানো, চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে ঝোলা... সব ডিউটি তো পালন করলো তারা এক সঙ্গেই... [জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল]

এভাবেই লেখক চমৎকার নৈপুণ্যে বুলেটের বর্তমান প্রসঙ্গের সূত্র ধরে একাত্তর-পূর্ব লালমিয়া ও ইমামুদ্দিনের কৈশোর-যৌবন এবং একাত্তরের সময়পটে তাদের বিপরীত অবস্থান, ইমামুদ্দিনের বিয়ে, বুলেটের জন্ম, ইমামুদ্দিনের মৃত্যু, বুলেটের বেড়ে ওঠা এবং তার কৌতূহলী সত্তার উন্মেষকে লালমিয়ার চেতনায় মুদ্রিত করে দেন। এক বিশাল অংশ জুড়ে লালমিয়ার চেতনায় খেলা করে এই চিন্তারাশি। গল্পের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে আবার সে ফিরে আসে বর্তমানে, বুলেটের প্রশ্নের অনুষঙ্গে। গল্পশেষে প্রতীকী পরিচর্যার মাধ্যমে ইলিয়াস স্বাধীনতাবিরোধী পশ্চাৎপদ সুবিধাবাদী রাজাকার শ্রেণির প্রতি বুলেটকৃত আচরণের মাধ্যমে তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটান।

চেতনাপ্রবাহরীতি বিন্যাস পদ্ধতির দিকে চোখ ফেরালে পাঠক উপলব্ধি করবেন অতীতচারিতা, স্মৃতিকাতরতা কিংবা নস্টালজিয়ার মাধ্যমে ইলিয়াস চরিত্রের চেতনসত্তার প্রবহমান গতিকে গল্পে ধারণ করলেও অতীতচারিতাই তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। ইলিয়াসের অতীতচারিতা বা স্মৃতিকাতরতা বর্তমানের প্রসারণমাত্র। বিশ্বসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির ধারক সাহিত্যিকগণ একই পদ্ধতিতে চেতনাকে গল্পে রূপায়িত করেননি। 'প্রুস্তে অতীতই প্রধান, বর্তমানে ক্ষণিক পর্যটনের পরই আবার অতীতচারণায় তিনি ফিরে যান; কিন্তু জয়েসের চেতনাপ্রবাহে বর্তমানই প্রধান, অতীত বা ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই বিস্তার।'[২৩] সেদিক থেকে ইলিয়াসের সঙ্গে জয়েসের চেতনাপ্রবাহরীতির বিন্যাসে পদ্ধতিগত মিল লক্ষণীয়। অন্যদিকে জেম্‌স্ জয়েস ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সাহিত্যকর্মে বিন্যস্ত চেতনাপ্রবাহরীতির ধরন ও শৈলীতে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। উইলিয়াম জেম্‌সের পর্যবেক্ষণজাত সিদ্ধান্তে চেতনা নদীর মতোই বহমান আর চেতনাস্থিত ভাবনারা কথাবস্তুর মতো কংক্রিটে তৈরি নয়, তারা তরল, দ্রুত প্রবহমান, আবেগ অনুষঙ্গজাত, কাঠামোহীন এবং অবিন্যস্ত। জেম্‌স জয়েসের *ইউলিসিস* গ্রন্থে Molly Bloom-এর অন্তরঙ্গ আত্মভাষণে উইলিয়ম জেম্‌সের এই ভাবনারই অনুরণন শোনা যায়। জয়েসের সঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের চেতনাপ্রবাহরীতির বিন্যাসে তিনটি পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত, উল্‌ফের রচনাকর্মে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেছেন 'He Thought' কিম্বা 'She Wondered', দ্বিতীয়ত, স্বগতকথন ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্‌ফ্ একই ধরনের বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করেছেন যা জয়েসের গদ্যের তুলনায় ভিন্ন। তৃতীয়ত, স্বগতকথন ব্যবহারে উল্‌ফ্ চরিত্রের ব্যক্তিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে অতীতকাল ব্যবহার করেছেন। উল্‌ফে্র তৃতীয় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে ইলিয়াসের গল্পে, যেখানে লালমিয়া, ইব্রাহিম ওস্তাগর, প্রদীপ, আনোয়ার আলি, সমরজিতের ব্যক্তিক ইতিহাসকে গল্পে অতীতচারিতার মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন লেখক। এছাড়া ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় রূপক প্রতীক, উপমার প্রয়োগ করেছেন খুব বেশি। ইলিয়াসের গল্পের ভাষায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অলংকার ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর গল্পভাষা গীতল নয়, আবেগহীন, শুষ্ক এবং খটখটে। তবে প্রতীকী পরিচর্যা, যাদুবাস্তবতা কিংবা ইল্যুসন, কল্পনা, অতিলৌকিকতার প্রকাশ অনিবার্য ছিল বলেই চেতনাপ্রবাহরীতির গল্পে এইসব পরিচর্যারীতি ব্যবহার করেছেন ইলিয়াস।

গল্প-কাঠামো ছেড়ে এবার চোখ ফেরানো যেতে পারে ইলিয়াসের গল্প ভাষার দিকে। চেতনাপ্রবাহরীতি বিন্যাসে ভাষার একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। চেতনার অবিন্যস্ত চিন্তারাশিকে বিন্যস্ত করতে গেলে ভাষার প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণ ভাষা থেকে চেতনাপ্রবাহরীতিতে ব্যবহৃত ভাষা একটু ভিন্ন ধাঁচের। "এই ভাষাতে অনিশ্চয়তার সকল উপাদান বর্তমান থাকে, কারণ চরিত্রের অনুধাবনগুলির গঠনপর্যায়ে ভাষা পূর্ব অবস্থাতেই তাদের বর্ণনা করতে হয়। ভাষার যে দার্ঢ্য বা স্থিতি, তা ওই সততঃ সঞ্চরণশীল ভাব অনুভূতির পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।... একটি চিন্তার সাথে আরেকটি চিন্তা অনুষঙ্গরূপে যুক্ত হয়।"[২৪] মূলত এক চিন্তা কখনো টেনে আনে চরিত্রের শৈশব, কৈশোর, যৌবন কিংবা ঘটমান বর্তমানের নানা কথা, অথবা ভবিষ্যতের দিনগুলোর নানা পরিকল্পনা। লেখক এ ক্ষেত্রে Flash back এবং Flash forward রীতি ব্যবহার করেন। এ ধরনের সাহিত্যে Flash forward-এর 'অগ্রসরমানতা একটি আশ্চর্য রেখায় কখনো সম্মুখে যাবার আভাস দেয়, কখনো বা হঠাৎ পেছনে ফিরে চোরাগুপ্তা পথে হারিয়ে যায়।'[২৫] ইলিয়াসের চরিত্রগুলোর চেতনার ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো। 'Flash back', 'Flash forward', প্রতীকী-ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহারে ইলিয়াস তাঁর গল্প শরীরে আর চরিত্রের মানসচেতনায় চৈতন্যপ্রবাহরীতি বিন্যাসে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইলিয়াসের ছোটগল্পের আঙ্গিকে চেতনাপ্রবাহরীতির বিন্যাস-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ছিল বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়। সামগ্রিকভাবে তাঁর গল্পকাঠামো বিশ্লেষণ করলে অনুভূত হবে চেতনাপ্রবাহরীতির বিন্যাসে তিনি প্রাতিস্বিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। চেতনাপ্রবাহরীতিতে যেখানে চরিত্রের অন্তরঙ্গ আত্মকথনের অম্বিষ্ট হয়ে ওঠে উত্তম পুরুষ, সেখানে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্প ছাড়া ইলিয়াসের অন্য গল্পগুলোতে উত্তম পুরুষের পরিবর্তে লেখকের সর্বদর্শী-বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক অভিঘাতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর চেতনায় ভিড় করা প্রবহমান চিন্তারাশির অধিকাংশই স্মৃতিঅনুষঙ্গজাত। গল্প-শরীর, চরিত্রের চেতনাজগৎ এবং মনস্তাত্ত্বিক সময় এই তিনটি উপাদানের সুষম মিথস্ক্রিয়ায় ইলিয়াসের গল্পে বিন্যস্ত হয়েছে চেতনাপ্রবাহরীতি। ইলিয়াসের নৈপুণ্য এখানেই যে, তিনি মনস্তাত্ত্বিক সময়-ধারণাকে ব্যবহার করে তাঁর গল্পের বিশাল কালপটকে একটি তুচ্ছ মুহূর্তের আধারে বিন্যস্ত করতে পেরেছেন। এ কারণেই একটি চরিত্রের শৈশব-কৈশোর-যৌবন এমনকি তার পূর্বপুরুষের জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁর গল্পে সমান্তরালে বহমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যাকে ধারণ করেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলোর অস্তিত্ববান সত্তা নির্মাণে, ইলিয়াস সেই ধারাতেই চেতনাপ্রবাহরীতিকে আরো শৈল্পিকভাবে বিন্যস্ত করলেন তাঁর গল্প-শরীরে। গল্পে চরিত্রগুলোর সমাজ-বিবিক্ত নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, অনিকেতবোধ, অবদমিত আকাঙ্ক্ষার টানাপড়েন, অস্তিত্ব সংকট এবং নিম্নবিত্তের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করতে তাদের চেতনার জগতে বিচরণ করতে হয়েছে লেখককে। এক্ষেত্রে বহির্বাস্তবতার চাইতে স্বাভাবিকভাবেই লেখকের অম্বিষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তর্বাস্তবতা তথা চেতনার অবিন্যস্ত স্বরূপ উন্মোচন। ইলিয়াস তাঁর সেই অন্বেষণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. J.A. CUDDON, *A DICTIONARY OF LITERARY TERMS* [First Published 1977, by André Deutsch Ltd.], p. 660-661

২. M.H. ABRAMS, *A GLOSSARY OF LITERARY TERMS* [Holt, reinehart and winston, New York-1981], p. 187

৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য* [প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স], পৃ. ১০০ ও ১০৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫. সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ* [প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা], পৃ. ২৪০-২৪১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪১

৭. মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ* [প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৭, বাংলা একাডেমী] পৃ ২৩১

৮. বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ* [প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩, প্রকাশক এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭১] পৃ ৫৪

৯. Peter Childs, *Modernism* [First Published 2000, by Routledge, II New Fetter Lane, London, EC4.P4EE] P 47

১০. শামীমা হামিদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম : শব্দব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি* [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪০৮, বাংলা একাডেমী], পৃ. ১২১

১১. William James, *The Principles of Psychology* [New York : Henry Holt and Co., 1890], P. 224

১২. Peter Childs, Ibid, p. 80

১৩. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *কতিপয় প্রবন্ধ* [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৯৯, বাংলা একাডেমী], পৃ. ১৪৮

১৪. কবীর চৌধুরী, *স্যাঁদাল থেকে প্রুস্ত*, [প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৯১, বাংলা একাডেমী], পৃ. ৮১

১৫. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা* [প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, প্রকাশক : অনুপকুমার মাহিন্দার, পুস্তক বিপনি, ২৭, কলকাতা], পৃ. ১৩২

১৬. অলোক রায় সম্পাদিত, *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*, [প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৭, সাহিত্যলোক, কলকাতা], পৃ. ৭৭-৭৮

১৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

১৮. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *রচনাবলী* [প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা], ভূমিকাংশ, পৃ. ১৩-১৫

১৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *ফিরে দেখা সারাজীবন*, মুজিবুল হক কবীর, মাহবুব কামরান সম্পাদিত, [প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা], পৃ. ১২৯

২০. সাদ কামালী, যাদুবাস্তবতা ও ইলিয়াসের যোগাযোগ, *শালুক* (১১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, সম্পাদক: ওবায়েদ আকাশ), ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬৬

২১. রবীন্দ্র গুপ্ত, *উপন্যাস জিজ্ঞাসা* [প্রথম প্রকাশ : ২৮ আগস্ট, ১৯৯৫, কলকাতা], পৃ. ৪৫

২২. মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

২৩. রবীন্দ্রগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২৪. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১